সহস্রাব্দের শ্রেষ্ঠ মানুষ

সুপ্রিয় মুন্সী

মহাত্মা গান্ধীকে গত সহস্রাব্দের শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে ঘোষণা করা হয়েছে (টাইমস পত্রিকা, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৯)। অবশ্য সহস্রাব্দের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলে ঘোষিত প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন্ গান্ধীজীকে অনেক পূর্বেই প্রায় দেবতুল্য করেছেন যখন মহাত্মাজীর ৭৫তম জন্মদিবসে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন, 'রক্ত মাংসে গড়া এমন একজন মানুষ এই পৃথিবীতে হাঁটাচলা করেছিলেন এমন কথা হয়ত আমাদের ভাবী বংশধরেরা বিশ্বাসই করতে চাইবে না'। কেবল তাই নয়, মহাত্মা গান্ধীর আত্মবলিদানের পরে পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু যখন আইনস্টাইনের সাথে সাক্ষাৎ করেন তখন আইনস্টাইন্ ওঁকে জানিয়েছিলেন যে উনি তাঁর ডায়েরিতে গান্ধীজী কিভাবে তাঁর অহিংস অস্ত্রকে ব্যাপক হিংসার বিরুদ্ধে আরও শক্তিশালী করছিলেন তা গভীরভাবে প্রশংসার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। আর প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী পিত্রিম সোরোকিন্ কত পূর্বে লিখিত তাঁর গভীর চিন্তাশীল বই 'মানবিকতার পুনর্গঠন' উৎসর্গ করেছিলেন 'মৃত্যুহীন' বা 'অমর' মোহনদাস গান্ধীকে।

বহু ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে গান্ধীজীকে শ্রেষ্ঠ মানুষ নির্বাচিত করা বোধহয় স্বাভাবিকই হয়েছে। কারণ বোধ সম্পন্ন জীব মানুষ নিজেকে তার সঠিক মূর্তি বা পরিচয় দেখতে চায় এবং সত্যের প্রতি অবিচল, দ্বিচারিতাহীন গান্ধীজীর মধ্যেই হয়ত সে তার সঠিক পরিচয় খঁজে পায়।

প্রখ্যাত কবি রবার্ট ব্রাউনিং একবার লিখেছিলেন - 'জানা এক জিনিস, কিন্তু তা কাজে পরিণত করা আর এক জিনস'। কিন্তু এই এক মানুষ যিনি খালি জানতে চাননি, সত্য শিব সুন্দর এই তিন মুখ্য মানবিক মূল্যবোধের ওপর নির্ভর করে তাঁর জীবন জাপন করেছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই কথা লিখেছেন। তিনি লিখছেন যে এই নীতিগুলি সম্বন্ধে কত বলা হয় এমনকি এইগুলি সম্বন্ধে লিখেওছেন তিনি, কিন্তু সত্যি সত্যিই এইগুলিকে ভিত্তি করে কেউ জীবনধারণ বা চালনা করতে পারেন তা একমাত্র গান্ধীজীই দেখিয়েছেন। এই নীতি বা মূল্যবোধগুলি কি মনুষ্যকাম্য সব সদাচার - সত্য, ন্যায়, প্রেম, সহিষ্ণুতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও স্বাধীনতা - যেগুলি ব্যক্তি ও সমাজকে নিঁখুত করে'। ইউরোপ থেকে ফিরে কবিগুরু লিখছেন, ইউরোপে কি নেই - জ্ঞান আছে, শক্তি আছে, তবু সব সময়ে একটা সংশয় - কি হয়, কি হয়। কখন হয়তো কোন

ধ্বংসাত্মক কিছু ঘটে গেল। কেন এমন হয়? তিনি লিখেছেন যে এর কারণ বোধ হয় মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ অর্থাৎ 'মানব-সম্বন্ধ' তা নষ্ট হয়ে গেছে বলে। এক নিঃশ্বাসে গুরুদেব লিখছেন যে - 'আজ যদি মহাত্মাজী আসেন হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে কে আগে তাঁর পায়ের ধুলো নেবে। কিন্তু তাঁর না আছে দেহবল, না আছে রাষ্ট্রবল, না সৈন্যদল! তাহলে তাঁর কি আছে? তাঁর আছে হৃদয় যা সবাইকে কাছে টেনে নেয়। তিনি আমাদের, আমরা তাঁর'।

বস্তুতঃ যতগুলি অমানবিক ঝোঁক আছে, যা মানুষকে তার পকৃত কৃতকর্ম সাধনে বাধা দেয় বা সমাজে তার যে প্রকৃত ভূমিকা আছে তা পালন করতে বাধাদান করে, তার বিরুদ্ধে বিরামহীন আন্দোলন গান্ধীজী করেছেন, যেমন শোষণ, কেন্দ্রীয়করণ ও আধিপত্য, সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা এবং অবশ্যই হৃদয়হীন বস্তুতান্ত্রিকতা - যা মানুষের সৎগুণগুলিকে নষ্ট করে লাগামহীন ভোগবাদের জন্ম দিয়েছে এবং ইন্দ্রিয় ও স্বার্থসুখের জন্যে ব্যাপক দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়েছে।

একটি বিষয় আমাকে সব সময়েই বিস্মিত করেছে - সাম্যবাদ ও সংসদীয় গণতন্ত্র - যে দুটি মতবাদই সাম্য ও ন্যায়ের কথা বলেছে - তারা চাওসেস্কু বা একজন হিটলারের জন্ম দিয়েছে। কারণটি বোধ হয় সহজ। এই দুটি মতবাদের মধ্যেই এমন কোন পরস্পর বিরোধিতা আছে যা একজন সুযোগসন্ধানীকে ক্ষমতা দখল ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। বস্তুতঃ তত্ত্ব এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রে দুটি মতবাদই কাম্য যা প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে মহাত্মা গান্ধী কেবল একটি বিকল্প তত্ত্ব বা দর্শনের কথাই বললেন না, তা অর্জন করতে একটি নতুন উপায়ের কথাও বললেন - অন্যায়, অত্যাচার শোষণের বিরুদ্ধে বোদ্ধা নাগরিক বা আবাসিকে পরিণত হবার জন্যে জীবনে আবশ্যিক 'একাদশ ব্রত' পালন এবং 'গঠনমূলক কার্যক্রম' - সমাজ উন্নয়নের এক অভিনব পদ্ধতি যার দ্বারা কাঙ্খিত সমাজ ব্যবস্থা লাভ করা যাবে, ইত্যাদি। অভিনবভাবে তিনি বিনাশ ও গঠন একই সঙ্গে শুরু করলেন - সত্যাগ্রহ আন্দোলন যেমন শোষক ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে বিলোপ করতে সচেষ্ট হল তখন তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান, যার মধ্যে একটি নতুন উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থাও ছিল, কাঙ্খিত সমাজ স্থাপনে ব্রতী হল। এই সমাজব্যবস্থার একটি মুখ্য দিক ছিল ক্ষমতা এখানে কেন্দ্রীভূত না হয় মহাসাগরীয় বৃত্তের মত সঞ্চারিত হবে।

পরবর্তী সহস্রাব্দের দিকে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেঃ ম্যাকার্থার গান্ধীজীর মৃত্যুর পর বলেছিলেন যে গান্ধীজী তাঁর সময়ের অনেক পূর্বেই পৃথিবীতে এসে পড়েছিলেন। মানবেন্দ্রনাথ রায়ও অনুরুপ চিন্তা প্রকাশ করেছিলেন। এর একটি অর্থ হতে পারে যে গান্ধীজীকে উপলব্ধি ও অনুসরণ করার মত মানবিক অগ্রগতি আমাদের হয়নি। এই বিষয়ে কোনোও সন্দেহ নেই যে একদিকে আনবিক অস্ত্রের সমরসজ্জা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নানা কারণে সীমিত যুদ্ধ জীবনকে যেমন আতঙ্কিত করেছে তেমনি অপরদিকে প্রাকৃতিক সম্পদের হ্রাস প্রাপ্তি ও পরিবেশ দূষণ মানুষ এবং জীবজগতকে খাদের মুখে এনে ফেলেছে। এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য একটি বিকল্প, সকলের জন্য কল্যাণকর শোষণহীন অহিংস সমাজ স্থাপনের জন্য গান্ধীজী চেষ্টা করেছিলেন এবং সমগ্র বিশ্বজুড়ে বোদ্ধাগণ বোধহয় এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। গান্ধীজী বুঝতে পেরেছিলেন যে বিজ্ঞান ও তার প্রয়োগকে অকল্যাণের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে এবং পরিণতিতে মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলি যথা - লোভ, লালসা, ক্রোধ, ভয়, অহংবোধ ও স্বার্থচিন্তা প্রবৃতির বহিঃপ্রকাশ ব্যাপকতা ধারণ করে সুস্থসমাজবোধ ও জীবনকে আচ্ছন্ন করেছে। এই পরিস্থিতিকে গান্ধীজী বলেছেন মনস্তাত্ত্বিকবিকার। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে এই মানসিকতা, যা এই অধগামী প্রবণতা ও তার কুফলের জন্যে মূলতঃ দায়ী, তা পরিবর্তনের জন্য যদি অবিরাম লড়াই না চালানো যায় তাহলে সমূহ বিপদের সম্মুখীন আমরা হতে পারি। এই লড়াইয়ের হাতিয়ার হিসেবে তিনি এক অভিনব অস্ত্র গড়ে তুললেন - সত্যসত্যি বা প্রেমশক্তি অথবা আত্মশক্তির ওপরে যা আধারিত - বস্তুবিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের যেটি এক অপূর্ব মেলবন্ধন। রাষ্ট্রের দ্বারা কোন অবিচার হলে প্রতিবাদের পথটা কি? গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সভা সমিতির মাধ্যমে প্রতিবাদ জানানো সর্বকালের পন্থা। গান্ধীজী অবশ্য বিশ্বাস করতেন যে মানুষ মূলতঃ ও সহজাতভাবে এবং যদি এর ব্যতিক্রম হয় তবে প্রচেষ্টার দ্বারা সে ভালো হয়ে উঠতে পারে। সত্যসত্যি বা আত্মশাক্তি অর্জনে এই বিশ্বাসের প্রয়োজন গভীর।

অবশ্য বিজ্ঞান যে এই বিষয়ে চিন্তা ও অনুশীলন করছে না তা নয়। বলা হচ্ছে চরম বিশ্লেষণে এটি প্রতিয়মান হয় যে সব বস্তুই মূলতঃ শক্তি বা তেজের আঁধার, হয়ত বিভিন্ন আকারে তা বিস্তৃত। বস্তুবিজ্ঞানী যুক্তিসম্মত বিশ্লেষণের দ্বারা যেমন সবকিছুর মধ্যেই সমত্বের আভাস পান, তেমনি অদ্ধাত্মবাদী প্রেম ও প্রজ্ঞা বা অনুভূতির দ্বারা সেই একই উপলব্ধিতে পৌঁছান। থোরো লিখেছেন - 'প্রেম নিঃশ্বেষিত হয় না।..... তা সারা বিশ্বকে আলোড়িত করে'। সত্যও তাই, তা বিশ্বজনীন ও সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। সভ্যতাকে সুরক্ষিত করতে ও আরো অগ্রসর হতে দুটি শক্তি মূল চালিকাশক্তি। গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব ও কার্যের মধ্যে এই দুটি শান্তিপূর্ণ বিকাশ

ঘটেছিল। বস্তুত আমাদের নৈতিক অগ্রসরতা বা মূল্যবোধ নির্ভর জীবনযাত্রা, যা সকলের জন্য চিরস্থায়ী সুস্থ, স্বচ্ছল, কল্যাণময় জীবনের ব্যবস্থা করতে পারে, তা অর্জন ও প্রতিষ্ঠা করতে গান্ধীজীবনী একমাত্র চাবিকাঠি। পরবর্তী সহস্রাব্দ আরো অর্থবহ, শান্তিময় অস্তিত্বের স্বাক্ষী হোক এবং বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট অথবা হজরত মহম্মদ যেমন চেয়েছিলেন তেমনি সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধে আবদ্ধ হয়ে সকলের জন্যে মঙ্গলময় এক জীবন লভ্য হোক, কালমার্কস থেকে এরিক ফ্রমের এইটিই তো ছিল আকাঙ্খা।

এটি স্বীকৃত সত্য যে গত সহস্রাব্দের কাছে মহাত্মা গান্ধী ছিলেন বিস্ময়কর। পরবর্তী সহস্রাব্দে মানব সভ্যতা আরো উন্নততর হয়ে তার কাঙ্খিত পরিণতিতে উত্তরণের জন্যে গান্ধীজীকেই সঠিক পথনির্দেশক হিসাবে চিহ্নিত করবে এইটিই আমার ধারণা।